Bangladesh
Journal of
Political
Economy

© 2012 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 119-137
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

টেকসই উন্নয়ন : বাংলাদেশের নারী

হান্নানা বেগম*

পূর্বকথা

টেকসই উন্নয়নের আদত কথা হলো মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মৌলিক চাহিদা পূরণের স্থিতিশীল অবস্থার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এতে কথা থাকে যে এসব চাহিদা পূরণ করতে যেয়ে যেন প্রাকৃতিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, যেন পৃথিবীর জীবন সহায়ক প্রাকৃতিক ক্রিয়া/প্রক্রিয়া বিদ্যমান ও কার্যকর থাকে। মানবিক দিক থেকে সতর্কবাণী হলো বর্তমান প্রজন্মকে এমনভাবে তাদের আর্থসামাজিক প্রয়োজনসমূহ মেটাতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোনো বিপদ আশঙ্কা তৈরী না হয়। আর মানুষের যুগ যুগান্তরের আকাঙ্খা পূরণে সকলেই যাতে ন্যায্যভাবে সকল অগ্রগতির অংশীদার হতে পারে। এভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মেলবন্ধনে, প্রকৃতি ও মানুষের মেলবন্ধনে, ধনী ও দরিদ্রের মেলবন্ধনে যে সমাজ ও অর্থনৈতিক সমতা হয় তাই টেকসই সমাজ, টেকসই উন্নয়ন। এজন্যই গবেষকগণ যুগ যুগ ধরেই গবেষণা করছেন কোথায় প্রকৃতি ও মানুষে, আবার মানুষে মানুষে গরমিল রয়েছে। যে কারণে থমকে যায়, দিক ভ্রান্ত হয় টেকসই উন্নয়ন, ওলট-পালট হয় মানব অগ্রযাত্রা। মূলত গবেষকদের এসব ধারণার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভ চিহ্নিত করা যায়- প্রথমত- অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দ্বিতীয়ত- সামাজিক বা মানবিক উন্নয়ন, তৃতীয়ত- পরিবেশগত ভারসাম্য।

আমরা অবশ্যই স্বীকার করব সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে। উন্নত বিশ্বে তো বটেই, উন্নয়নশীল এমনকি স্বল্প আয়ের দেশেও অর্থনৈতিক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সর্বত্র। তবে একইসাথে বৈষম্য বেড়ে চলেছে প্রকটভাবে। এই বৈষম্য যেমন ধনী-দরিদ্রের, এই বৈষম্য মানুষে মানুষে। একইভাবে এই বৈষম্য নারী-পুরুষের, জেন্ডার অসমতার। আর গবেষকগণ বলতে চাচ্ছেন, নারী-পুরুষের এই বৈষম্যের কারণেই টেকসই উন্নয়নের অর্থনীতি কিছুদিন পর পর মুখ থুবড়ে পড়ছে। যা কিছুদিন আগেও আমরা লক্ষ্য করেছি, এবং এখনও চলছে।

প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য

প্রথমত- টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতার গুরুত্ব অনুধাবন, এ সম্পর্কে গবেষকদের মতামত ও বিশ্ব চিত্র লাভ।

---

* *লেখক পরিচিতি: পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি*

দ্বিতীয়ত- টেকসই উন্নয়নের প্রধান শর্ত দেশে নারীর সাংবিধানিক ও সামাজিক অধিকার।

তৃতীয়ত- টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বাস্তবত নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার উপস্থাপন এবং মূল্যায়ণ।

১. টেকসই উন্নয়নে জেন্ডার সমতাঃ গবেষকদের মতামত ও বিশ্বচিত্র

টেকসই উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার বিষয়টি কোন রাষ্ট্রের একক বিষয় নয়। এটি একটি বৈশ্বিক বিষয়। দেশে দেশে এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে।

১.১ টেকসই উন্নয়নঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নারী

দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু কাজটি গতি পাচ্ছে না। এগুচ্ছেনা। প্রশ্ন হলো, এখানে এমন কোন উপাদানের অভাব নেই তো যার ভূমিকার অভাবে এ কর্মযজ্ঞ গতিময়তা পাচ্ছে না? এ প্রশ্ন অর্থনীতিবিদদের, পরিবেশবিদদের, সমাজবিদদের। বড় সংখ্যক গবেষকের মত হলো, বিশ্বকে জেন্ডার অসমতার জন্য বড় রকমের মূল্য দিতে হচ্ছে। এ অসমতা থেকেই উদ্ভব হচ্ছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অসমতা, সামাজিক অসমতা ও পরিবেশগত অসমতা। আর এর ফলশ্রুতিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। Dr. Stevens, Economist in the US Government, তাঁর গবেষণায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'Whether Gender Equality is the missing link of Sustainable Development'. টেকসই অর্থনীতির গতিপথে জেন্ডার অসমতা কিভাবে অর্থনৈতিক সমতা, সামাজিক বা মানবিক উন্নয়ন এবং পরিশেষে পরিবেশ উন্নয়নকে ব্যাহত করছে তা তুলে ধরা হয়েছে উপরোক্ত লেখকের বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত Sustainable Development Insights-এর বহু গবেষণালব্ধ, তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা প্রবন্ধ "Are Women the key to Sustainable Development" প্রবন্ধে। গবেষকগণ বলছেন, কিছুদিন আগেই পুঁজিবাদি বিশ্ব ধাক্কা খেয়েছে, অর্থনীতিতে ধস নেমেছে যা বিশ্বের প্রায় সব দেশকে কমবেশী নাড়া দিয়েছে। এটি এককভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরুষ প্রধান অর্থনীতির ভুলের কারণে হয়েছে। যদিওবা এই সময়কালে যারা ঘটণা ঘটিয়েছেন, ব্যাংকের পুরুষ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, তারা ভারি বোনাস পেয়েছেন। আর নারীগণ মন্দার কারণে অধিকতর মন্দ সময় কাটিয়েছেন। বাস্তবতা হলো, বিশ্ব অর্থনীতি গঠনে নারী-পুরুষের সম অবদান নেই। দুঃখজনক সত্য হলো, এ কাজ ফরমাল হোক অথবা ইনফরমাল হোক, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই নারীর কাজকে কমবেশী খাটো করে দেখা হয়। নারীর প্রতি এ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সত্য রূপ ধারণ করেছে, যা বিশ্বের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশ্বময় নারীরা সন্তান প্রতিপালনে সময় দেওয়ায় সময়ের সংকটে ভোগে। তাদের অনেকে চাকরি করতে পারে না। এ কারণে কাজ করলেও তাঁরা মানসিক স্থিতি পায়না। এই সুযোগে পুরুষ উন্নয়নের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এক্ষেত্রে দুনিয়া জুড়েই বড় সমস্যা হলো কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তাদের শিশুদের নিরাপত্তা ও যত্নের জন্য যথেষ্ট পরিমানে দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। কিন্তু যেসব দেশ এটি করেছে, যেমন- ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্সে কর্মক্ষেত্রে শিশু দিবাযত্ন সরকারকর্তৃক বাধ্যতামূলক হওয়ায় সেখানকার নারীরা নিশ্চিন্তে চাকরি করছে এবং সেখানকার জন্ম হার জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দেশের চেয়ে বেশী। নারীর জীবনকে ভারসাম্যময় করে এসব দেশ একইসাথে বর্তমান শ্রমশক্তি এবং ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তিতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে।

যদিও বিশ্বে কর্মক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু তারা এখনও অর্থনীতি বা রাজনীতিতে পুরুষের সমপর্যায়ে সময় দিতে পারছে না। চলমান এ বৈষম্য আরও বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে। বিশ্বের কোন কোন দেশ এবং আমাদের বাংলাদেশ কোটা প্রথা প্রচলন করেছে। এতে অবস্থার সামান্য উন্নয়ন ঘটেছে। নরওয়ের কর্পোরেট বোর্ড কমপক্ষে শতকরা ৪০ জন নারী অন্তর্ভূক্ত করেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। ফলতঃ বিশ্বের মধ্যে এরা' নারী পরিচালকেরা নেতৃত্ব দিচ্ছে। ফ্রান্স সরকার সম্প্রতি নিয়ম করেছে যে কোন কোম্পানির বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৫০ জন নারী হতে হবে।

জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংক তাদের গবেষণায় বলছে, যেসব দেশে অর্থনীতিতে নারীকে তুলে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের চেয়ে জেন্ডার নিরপেক্ষ দেশের স্থিতিশীলতা তুলনামূলকভাবে কম। অন্য এক গবেষণার মত হলো, পুরুষের হাতে অর্থ দেওয়া হলে তা ব্যক্তিগত খরচে ব্যয় হয় বেশী। আর নারীর হাতে তা পরিবারের কল্যাণে ব্যয় হয়। নারী সবসময় দারিদ্র দূর করতে চায়। কারণ তারা সবসময় এ উদ্দ্যেশেই পরিবার পরিচালনা করে। বিশ্বব্যাংক সাম্প্রতিককালে এ সম্পর্কে নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য- “Gender Equality as Smart Economics” নামে নিউজলেটার প্রকাশ করে। যেখানে তারা এ মত দিতে চেষ্টা করেন যে, অধিকতর উন্নয়নের খাতিরে নারীকে সুযোগ দিতে হবে। নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করলে তা অর্থনীতিতে গুণক ফলাফল দেয়। ব্যাংক এবং দাতা সংস্থাদের নারীকে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেখানোর চেষ্টা নিতে হবে। নারীকে তাদের ঘরোয়া কাজ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষির মতো ধীরগতি সম্পন্ন কাজ থেকে সরিয়ে ভূমি, শ্রম, উৎপাদন ইত্যাদি খাতের মতো ক্ষমতা সম্পন্ন বিষয়ে যুক্ত হতে হবে। যাতে তারা অর্থনীতি, সমাজনীতি ও পরিবেশনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

১.২ টেকসই উন্নয়নঃ সামাজিক উন্নয়ন ও নারী

উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগে বার্ষিক আয় অথবা মাথাপিছু আয় ছিল একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিচিতি। এখন ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে সংখ্যাগত পরিমাপের চেয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। অতএব এখন উন্নয়নে সামাজিক কল্যণ ও পরিবেশগত ভারসাম্যের বিষয়টি প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। উন্নয়ন ধারাকে এমনভাবে অগ্রসর করার প্রচেষ্টা চলছে যাতে উন্নয়ন টেকসই হয়। এখানে টেকসই উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ Gro Harlen Brutland, যিনি নরওয়ের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী, যার নেতৃত্বে প্রথম ‘Sustainable Development Report our Common future 1987’ প্রণীত হয়েছিল তাঁর বক্তবের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো। তিনি বলেছিলেন, “Don’t take more than your share”। এই গবেষকের মতে, টেকসই উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভের মধ্যে সামাজিক বা মানবিক উন্নয়ন সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এ কারণে যে, বৈষম্য সমাজে নেতিবাচক সংস্কৃতি তৈরি করে, বেকারত্ব সৃষ্টি করে এবং জেন্ডার বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয়।

ইতিমধ্যে বিশ্বের অনেক দেশ সবুজ উন্নয়নের জন্য কম কার্বন নিরসনের চেষ্টা করছে। কিন্তু দেশে নারী-পুরুষ বা সমাজে মানবিক বৈষম্য থাকলে সফলতার সম্ভাবনা খুব কম। বর্তমানে বিশ্বের বড় চিত্র হচ্ছে, দেশে দেশে এবং দেশের ভেতরে ধনী-গরীব পার্থক্য বেড়ে চলেছে। ২০০৮ সালে Sustainable Society Index এর সাথে অর্থনীতি, জলবায়ু এবং সামাজিক সম্পর্ককে সূচক ধরে যে গবেষণা করা হয় তাতে যুক্তরাজ্যের স্থান ৫০তম এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ৬৬তম। টেকসই অর্থনীতিতে তাদের স্থান এত নীচে হওয়ার প্রধান কারণ দেশের ভেতরকার সামাজিক বৈষম্য। এইসব দেশে যে কোন

অর্থনৈতিক দুর্যোগে সবচেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় Single Mother, সেসময়ে যার চাকুরী এবং থাকার সংস্থান কোনটিই থাকে না। অতএব মনে রাখার বিষয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য সামাজিক ভারসাম্য তৈরি করে না। প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনতে হলে আগে মানবিক ভারসাম্য আনতে হবে।

ইতিমধ্যে World Economic Forum তাদের গবেষণায় দেখিয়েছে, কিভাবে একটি দেশ তার সম্পদ এবং সুযোগকে নারী-পুরুষের মধ্যে বন্টন করে। এ গবেষণায় জেন্ডার সমতায় সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে আইসল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ড এবং সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে চাদ এবং ইয়েমেন। জাপান ও কোরিয়া যারা সবুজ উন্নয়নের চ্যাম্পিয়ন, তারা অনেক পিছনে পরে আছে। জেন্ডার নির্দেশিকায় তাদের স্থান যথাক্রমে ৭৫তম এবং ১১৫তম। অন্যদিকে গরীব দেশগুলো অর্থনীতি এবং সামাজিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না। এ ব্যাপারে গবেষণা করেছে Organization of Economic Co-Operation and Development (OECD)-এর Social Institution and Gender Index মতে নারীর প্রতি সহিংসতা, সম উত্তরাধিকারের অভাব, যেগুলো সরাসরি আয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় এসবের নিকৃষ্ট অবস্থানে আছে দক্ষিণ এশিয়া, সাব সাহারা আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য, এবং উত্তর আফ্রিকা। এসব দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংস্কৃতি নারীর কর্মসংস্থান ও উত্তরাধিকারে বাধা হয়ে আছে, যা সামাজিক/মানবিক উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর।

১.৩ টেকসই উন্নয়নঃ পরিবেশগত উন্নয়ন ও নারী

গবেষকগণ বলছেন, নারীরা মূলতঃ পরিবেশ বান্ধব। জাপানের নারীদের উপর এক গবেষণায় প্রত্যক্ষ করা গেছে, নারীগণ উপলদ্ধি করেন, পরিবেশের জন্য তাদের কিছু করার আছে। কারণ পরিবেশের দুর্দশায় নারী অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গবেষকগণ বলেছেন, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন কম বলেই তাকে এ ক্ষেত্রে বেশি বেকায়দায় পরতে হয়। হ্যারিকেন, ক্যাথরিনার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর দেখা গেছে, নারীই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে যে ঝড় হয়েছে তাতেও নারী অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। গবেষকগণ এটিও বলেছেন, ২০০৪ সালে এশিয়ান সুনামিতে শতকরা ৭০ শতাংশ মহিলা নিহত হন। ইন্ডিয়াতে দুর্যোগের পর নারীরা আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে উঠে দাঁড়ায়।

গবেষকগণ এভাবে বিভিন্ন গবেষণার উপসংহারে বলেছেন, বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন অর্জিত না হওয়ার প্রধান কারণ নারীর অনুন্নয়ন। নারী যদি যথাযথ সংখ্যায় যথাযথ ভাবে ক্ষমতার অধিকারী হতো তাহলে টেকসই উন্নয়ন দ্রুতগতি সম্পন্ন হতো।

২. টেকসই উন্নয়ন : বাংলাদেশে নারীর অধিকার

বাংলাদেশে নারীর অধিকারের প্রধান উৎস প্রথমতঃ দেশের সংবিধান এবং দ্বিতীয়তঃ সরকারকর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ। চুক্তিসমূহের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় সিডও এবং বেইজিং কর্মপরিকল্পনা।

২.১ বাংলাদেশে নারীর সাংবিধানিক অধিকার

- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিঃ জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে **(অনুচ্ছেদ-১০)**।

- অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবন-ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা, কর্মের অধিকার, মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থান-এর নিশ্চয়তার অধিকার, বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশ-এর অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুজনিত বা বৈধব্য, মাতা-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত বা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার **(অনুচ্ছেদ-১৫)**।
- অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা **(অনুচ্ছেদ-১৭)**।
- জনস্বাস্থ্য নৈতিকতার, মাদক পানীয় ও স্বাস্থ্য হানিকর ভেষজ ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থাসহ গণিকাবৃত্তি ও জুয়া খেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ **(অনুচ্ছেদ-১৭)**।

- **সুযোগের সমত**
  - সকল নাগরিক-এর জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।
  - মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্ব সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে **(অনুচ্ছেদ-১৯)**।
- **মৌলিক অধিকারঃ মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিলঃ**
  - এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই সংবিধান প্রবর্তন হইলে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।
  - রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জসপূর্ণ কোন আইন প্রণয়ন করিবে না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে **(অনুচ্ছেদ-২৬)**।
- **আইনের দৃষ্টিতে সমতাঃ** সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনে সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী **(অনুচ্ছেদ-২৭)**।
- **ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্যঃ**
  - কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জনস্বাস্থ্যের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেনা।
  - ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নির্বিশেষে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।
  - কেবল ধর্ম গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জনস্বাস্থ্যের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোন রূপ অক্ষমতা, বাধ্য-বাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

- নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না **(অনুচ্ছেদ-২৮)**।

- **সরকারী নিয়োগলাভের সমতাঃ**
  - প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।
  - কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ-নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য পদর্শন করা যাইবে না।
  - এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-

    নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ কোন বিধান প্রণয়ন করা হইতে,
    - কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সম্বলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,
    - যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপোযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপে যে কোন শ্রেণীর বিরোধ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না **(অনুচ্ছেদ-২৯)**।

- **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারঃ** আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইন অনুযায়ী কেবল আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভ যে-কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে **(অনুচ্ছেদ-৩০)**।

- **জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণঃ** আইনানুযায়ী ব্যতীত ও ব্যক্তির স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না **(অনুচ্ছেদ-৩১)**।

২.২ বাংলাদেশে নারীর অধিকারঃ সিডও সনদ এর ধারাসমূহ

জাতিসংঘ তার ঘোষণাপত্র থেকে সর্বজনীন মানবাধিকার দলিল পর্যন্ত সর্বত্র নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রেখেছে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেছে, নারী মানব জাতির অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও নারীর অধিকার মানবাধিকার রূপে স্বীকৃত হচ্ছে না। কারণ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সব দলিলে, নারী-পুরুষকে এক অবস্থান থেকে দেখা হয়েছে। একই অধিকার ভোগ করতে পারার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সমঅবস্থায় না থাকলে সমঅধিকার ভোগ করা যায় না। কিন্তু বাস্তবে প্রথমতঃ নারী পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে, দ্বিতীয়তঃ নারীর মাতৃত্ব বা প্রজনন ভূমিকা বা বিশেষ অবদানের জন্য তার বিশেষ কিছু চাহিদা আছে এবং সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। এজন্য আলাদা সনদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে, উপরোক্ত দুটো সমস্যাকে সামনে নিয়ে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে সমতার সৃষ্টি করা এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সিডও সনদের সৃষ্টি।

সিডও সনদ গৃহীত হয়, ১৯৭৯ সনের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে। ইংরেজীতে– পুরো নাম Convention of the Elimination of All forms of Discrimination Against women-CEDAW (সিডও)। বাংলায় আমরা বলি 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ।' ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ২০টি রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভের পর সিডও সনদ কার্যকর বলে ঘোষিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে এ সনদে স্বাক্ষর করে। সিডও এর ধারা-১৮ অনুযায়ী শরীক রাষ্ট্রকে এ সনদ অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট সিডও কমিটির বিবেচনার জন্য সনদে বর্ণিত ধারার আলোকে এক বছরের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। পরবর্তীতে প্রতি চার বছর অন্তর। সরকার ও দেশের এনজিও-দের একটি বিকল্প প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হয়। সিডও কমিটি তাদের বাৎসরিক সভায় বিশদভাবে এসব পর্যালোচনা করে এবং পরবর্তীতে কর্ম পরিকল্পনার জন্য সুপারিশ রাখে।

সিডও সনদের ধারাসমূহ

• ধারা-১ বৈষম্যের সংজ্ঞা। • ধারা-২ বৈষম্য বিলোপ করে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ। • ধারা-৩ নারীর মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। • ধারা-৪ নারী পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা আনয়নে সাময়িক ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। • ধারা-৫ নারী-পুরুষের প্রচলিত ভূমিকা ও কর্মকান্ড ভিত্তিক নেতিবাচক সংস্কৃতি পরিবর্তন। • ধারা-৬ পতিতা বৃত্তি দূরীকরণ। • ধারা-৭ রাজনীতি ও জনজীবনের সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণের সমঅধিকার। • ধারা-৮ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের প্রতিনিধিরূপে নারীর অংশগ্রহণ। • ধারা- ৯ নারীর জাতীয়তা ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। • ধারা-১০ সকল ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীর সম অধিকার নিশ্চিতকরণ। • ধারা-১১ চাকুরি, কর্মসংস্থান ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা। • ধারা-১২ নারীর জন্য মাতৃত্বকালীন পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান। • ধারা-১৩ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা প্রাপ্তিতে নারীর সমান অধিকার। • ধারা-১৪ পল্লী নারীর উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়নে তাদের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ। • ধারা-১৫ নারীর আইনগত ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। • ধারা-১৬ বিবাহ সহ সকল ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয়ে নারী পুরুষের সমঅধিকার।

২.৩ বাংলাদেশে নারীর অধিকার: বেইজিং কর্মপরিকল্পনা

১৯৯৫ সালে ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৯ টি দেশ নারী উন্নয়ন নীতিমালার বৈশ্বিক রূপরেখা হিসেবে প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন পূর্ণ অনুমোদন করে এবং এর আলোকে নিজ নিজ দেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে তা জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

এ পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের জন্য ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা হয়।

বিষয়সমূহ হলো: ১. নারীর দারিদ্র, ২. শিক্ষা, ৩. স্বাস্থ্য, ৪. নির্যাতন, ৫. সশস্ত্র ও অন্যান্য সংঘাত, ৬. অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, ৭. ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ৮. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেশিনারী, ৯. মানবাধিকার, ১০. গণমাধ্যম, ১১. পরিবেশ ও উন্নয়ন, ১২. কন্যা শিশু।

এ দলিলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে-

প্রথমত: গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ে বর্তমান বিশ্বের নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এ পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যা নিরসনে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সরকার, কতিপয় সংস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর।

৩. টেকসই উন্নয়ন : বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার উপস্থাপন এবং মূল্যায়ণ

৩.১ টেকসই উন্নয়ন: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর অবস্থান

শ্রম শক্তিতে নারীর অর্জন ও সম্ভাবনা

সারণি-১ বিশ্লেষণে দেখা যায় নারী শ্রমশক্তির শতকরা হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে যা ১৯৭৪ সালে ছিল শতকরা ৪.১ শতাংশ। ২০০৬ সালে হয়েছে ২৯.২ %।

সারণি-২ এ দেখা যাচ্ছে ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০২-০৩ সময়ের মধ্যে তুলনামূলক পরিসংখ্যান বলছে বাংলাদেশে শহর/গ্রাম নারী/পুরুষ নির্বিশেষে শ্রম শক্তি বেড়ে চলেছে। সারণির ২য় অংশে ২০০২-০৩ সালের যৌগিক প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে । এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রবৃদ্ধির হার নারী পুরুষ নির্বিশেষে শতকরা ৪.৪%। এটি বাংলাদেশে একধরণের উন্নয়নের ঘোষণা দিচ্ছে। পুরুষের ক্ষেত্রে এটি ৩.৮% এবং নারীর ক্ষেত্রে ৬.৫%। আবার শহর এলাকায় এ প্রবৃদ্ধির হার নারীর চেয়ে পুরুষের ক্ষেত্রে বেশী। গ্রামে পুরুষ শ্রম শক্তির প্রবৃদ্ধির হার ২.৯%, নারীর ৬.২% যা পুরুষের চেয়ে নারী শ্রম শক্তি বৃদ্ধির

সারণি ১: শ্রম শক্তিতে নারী (%)

সময়	জাতীয়	পুরুষ	মহিলা
১৯৭৪	৪৩.৮	৮০.৪	৪.১
১৯৮১	৪৪.৩	-	৪.৩
১৯৮৪	৪৩.৯	৭৮.৫	৮.০
১৯৮৫	৪৩.৯	৭৮.২	৮.২
১৯৮৬	৪৬.৫	৮১.৪	৯.৯
১৯৮৯	৪৭.০	-	-
১৯৯১	৪৮.৮	-	-
১৯৯৬	৫২.০	৮৭.০	১৫.৮
২০০০	৫৪.৯	৮৪.০	২৩.৯
২০০১	-	-	-
২০০৩	৫৭.৩	৮৭.৪	২৬.১
২০০৬	৫৮.৫	৮৬.৮	২৯.২

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস্, লেবার ফোর্স সার্ভে।

সারণি ২: বার্ষিক গড় শ্রম শক্তি প্রবৃদ্ধির হার (হাজার)

সময় এবং উৎস	বাংলাদেশ			শহর			গ্রাম		
	উভয়	পুরুষ	মহিলা	উভয়	পুরুষ	মহিলা	উভয়	পুরুষ	মহিলা
১৯৯৯-২০০০ LFS	৪০৭২৮	৩২১৭১	৮৫৫৭	৯২২৮	৭০৮৫	২১৪৩	৩১৫০০	২৫০৮৬	৬১৪১
২০০২-২০০৩ LFS	৪৬৩২৪	৩৫৯৭৮	১০৩৪৬	১১২৮৫	৮৬১৪	২৬৭১	৩৫০৩৯	২৭৩৬৪	৭৬৭৫
Annual compound growth rate (শতাংশ)									
২০০২-২০০৩ LFS	৪.৪	৩.৮	৬.৫	৬.৯	৬.৭	৭.৬	৩.৬	২.৯	৬.২

Note: LFS-Labour Force Survey Conducted by BBS
***Source:** Labour Force Survey 2002-2003, Bangladesh Bureau of Statistics, December-2004.*

হারের ঘোষণা দেয়। শ্রম শক্তি প্রবৃদ্ধির এই চিত্র প্রমাণ করে, সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার খোলা থাকলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী অবদান রাখতে পারে।

শ্রম বাজারে জেন্ডার বৈষম্য

সারণী: ৩-এর প্রাপ্ত তথ্য থেকে বাংলাদেশের শ্রম বাজারে জেন্ডার বৈষম্যের ব্যাপারটি খুব পরিস্কার ভাবে বুঝা যাচ্ছে। শ্রম শক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী পুরুষের অর্ধেকের কম নারী শ্রম বাজারে অংশগ্রহণ করছে এবং ৩৪.১৫ শতাংশ নারী অর্ধ বেকারত্বের সম্মুখীন যেখানে পুরুষের হার ১৪.৪ শতাংশ। নারীদের একটি বড় অংশই (৮১.৭%) পারিবারিক (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মজুরি বহির্ভূত) ক্ষেত্রে কাজ করে থাকেন। আনুষ্ঠানিক শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় অনেক পেছনে- শতকরা মাত্র ৭.৭ ভাগ। নারী আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, যেখানে পুরুষের হার ১৪.৬%।

সারণী: ৪-এর প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধু শ্রম বাজারে অংশগ্রহণই নয়, কাজের মূল্যমানের বিচারেও বাংলাদেশের নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক পেছনে। পেশাগত বা প্রশাসনিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম। অপর দিকে কৃষি, বন ও মৎস খাতের মতো নিম্ন মজুরির অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশী। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নারীর অবস্থান তাই নারীর অর্থনীতির নিরাপত্তাহীনতাই প্রকাশ করে।

সারণি ৩: শ্রম বাজারের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক (%)

নির্দেশক	নারী	পুরুষ
শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণের হার	৩৬.০	৮২.৫
বেকার	৫.৮	৪.১
অর্ধ বেকার (সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টার কম কাজ করে)	১৪.৪	৩৪.১৫
পারিবারিক শ্রম	৮১.৭	১৩.৯
আনুষ্ঠানিক খাত	৭.৭	১৪.৬

***উৎস:** শ্রম শক্তি জরিপ ২০১০, বিবিএস*

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, শ্রম বাজারে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান তার মজুরির ক্ষেত্রেও প্রতীয়মান হয়। পরিসংখ্যান ব্যূরোর ২০০৭ সালের মজুরি জরিপ থেকে দেখা যায়- একই শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য অনেক। একজন নারী শ্রমিকের দৈনিক গড় আয় ৯২ টাকা যেখানে

সারণি ৪: ১৫ বছরের এবং তদূর্ধ বয়সে কর্মরত জনগোষ্ঠী

নির্দেশক	নারী	পুরুষ
পেশাগত, টেকনিক্যাল	৩.২	৪.৯
প্রশাসনিক ম্যানেজারিয়াল	০.৬	১.৬
কারণিক কাজ	০.৬	২.৪
সার্ভিস	৮.১	৪.৫
সেলস	৮.০	১৮.১
কৃষি, বন ও মৎস	৬৪.৮	৪০.১
উৎপাদন ও যাতায়াত কর্মী	১৪.০	২৬.৭

উৎস: *শ্রম শক্তি জরিপ ২০১০ বিবিএস*

একজন পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক গড় আয় ১৩২ টাকা। অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মজুরির বৈষম্য ৫০.৬%, যা নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতার পরিচায়ক। শুধু মজুরিই নয় কর্মস্থলে নিরাপত্তাহীনতা ও যৌন হয়রানি, বাসস্থানের অভাব, শৌচাগারের অভাব, মাতৃত্বকালীন ও প্রসবকালীন ছুটির অভাব- ইত্যাদি সব কিছু সমস্যা শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে।

সারণি-৫ ব্যাখা করলে এক কথায় বলা যায়, ১৯৯৯ সালে বিসিএস প্রশাসনে নারী কর্মকর্তার মোট শতকরা হার ৮.৫৪%, আর ২০০৬ সালে এটি হয়েছে ১৫.০৫%, যা একদিকে নারীর অগ্রগতি বোঝাচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে মোট নারী নিয়োগের হার হচ্ছে মাত্র শতকরা ১৫.০৫%, যা সরকারী সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীর স্বল্প প্রতিনিধিত্বের চিত্র বহন করছে।

সারণি: ৬-এ বিভিন্ন প্রকল্পে নারীর অংশ দেখানো হয়েছে যা সন্তোষজনক। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয় না। আবার বাস্তবায়িত হলেও প্রকৃত অর্থে এখানে নারীর অংশ কত তা নিরূপণ করা কঠিন হয়।

সারণি ৫: বিসিএস প্রশাসনে কর্মকর্তাদের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন

	১৯৯৯				২০০৬			
পদ			মহিলা				মহিলা	
	মোট	পুরুষ	সংখ্যা	শতকরা	মোট	পুরুষ	সংখ্যা	শতকরা
মোট	৪,৩৬৯	৩,৯৯৬	৩৭৩	৮.৫৪	৪,৪৯২	৩,৮১৬	৬৭৬	১৫.০৫

সূত্র: *সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (Database on women and children Issues, May 2008, Ministry of women and children Affairs)*

৩.২ টেকসই উন্নয়নঃ বাংলাদেশে নারীর সামাজিক অবস্থান

বাংলাদেশে নারীর সামাজিক সমতা ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি সাধারণ

সারণি ৬: ২০১১-১২ সালের বাজেটের জেন্ডার প্রতিবেদন অবলম্বনে নারী বিষয়ক পরিসংখ্যান চিত্র

মন্ত্রণালয়ের নাম	কর্মকর্তার শতকরা হার ২০১১-১২ পুরুষ	নারী	২০১০-১১ পুরুষ	নারী	প্রকল্পে নারী উন্নয়নের অংশ (%)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮১.৭০	১৮.৩০	৯১.৬০	০৮.৩৯	২৩
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮২.৫০	১৭.৫০	৭৪.০০	২৬.০০	৩৪
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	-	-	৯২.৫৯	০৭.৪১	১৪
সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	-	-	৯৪.০	০৬.০০	১৯
দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	-	-	৯৪.০৪	০৫.৯৬	৭৮
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৫.২৯	০৪.৭১	৯৫.৫২	০৪.৪৮	৩৮
ভূমি মন্ত্রণালয়	-	-	৯২.৪০	০৭.৬০	১৩
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৯৩.২১	০৬.৭৯	৯৫.০০	০৫.০০	৪৪
এৎস ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯০.৩	০৯.৭০	৯০.১৪	০৯.৮৬	৩১
কৃষি মন্ত্রণালয়	৯১.৩৫	৮.৬৫	৯২.৩৩	০৭.৬৭	৩৫
তথ্য মন্ত্রণালয়	৮৪.৩৩	১৫.৬৭	৮৫.৩৯	১৪.৬১	১০
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	-	৮৮.০০	১২.০০	৬৭
স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	-	৯৬.৬০	০৩.৪০	৫২
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	-	৮৫.৫৫	১৪.৪৫	২০
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	-	২৮.০৮	৭১.৯২	৮০
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	-	৬৮.৮২	৩১.১৮	৪০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	-	৭৮.০০	২১.৯০	৪০
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	-	৭৬.৬১	২৪.২৮	২০
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	-	৭৪.০৭ (২০০৯-১০)	২৫.৩০ (২০০৯-১০)	২৮
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮১.৭৩	১৮.২৭	-	-	

সূত্র: *জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন, বাজেট ২০১১-১২।*

মানুষের মুখে মুখে রয়েছে। তবে এ সম্পর্কে মানুষের পরিচ্ছন্ন ধারণা নেই। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নকে অপব্যাখ্যা করা হয়। বাংলাদেশে নারীর সামাজিক সমতার বিষয়ে কিছু বলতে গেলে নিদেনপক্ষে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করতে হয়। যেমন: •নারীনীতি বাস্তবায়ন, •নারীর শিক্ষা, •নারীর স্বাস্থ্য, •নারীর রাজনৈতিক উত্তরণ, •পরিবারে নারীর অধিকার, •নারী সংগঠন, •নারী নির্যাতন, •মৌলবাদিদের প্রতি রাষ্ট্রীয় নমনীয়তা এবং ফতোয়ার মাধ্যমে নিকৃষ্ট নারী নিপীড়ন, •বেসরকারী সংস্থাকর্তৃক সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য

সারণি: ৭ থেকে কিছু চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত: প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে কন্যা শিশুর অবস্থান পুত্র শিশুর থেকে কিছুটা ভালো। এক্ষেত্রে সরকারী বিভিন্ন নারী বান্ধব কর্মসূচী এবং নীতিমালার (যেমন মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি প্রদান) বিশেষ অবদান রয়েছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য

যে সামগ্রিক ভাবে প্রথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে কন্যা বা পুত্র শিশুর অবস্থা হতাশা ব্যঞ্জক। দ্বিতীয়ত: উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান অনেক পেছনে। স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রেও নারীদের অবস্থান অনেক ভঙ্গুর। অতএব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার নিম্নস্তরে নারীদের সমঅধিকার নিশ্চিত করা গেলেও উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের দুর্বল অবস্থান নারীর শ্রম বাজারে উচ্চ মজুরির কর্মে অংশগ্রহণ ও আর্থ সামাজিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

সারণি ৭: শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য (%)

নির্দেশক	নারী	পুরুষ
স্বাক্ষরতা (২০০৯)	৫৪.৩	৬২.৬
প্রাথমিক শিক্ষা খাতে এনরোলমেন্ট (২০১০)	৫০.৫	৪৯.৫
মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে এনরোলমেন্ট (২০১০)	৫৩	৪৭
উচ্চতর শিক্ষা খাতে এনরোলমেন্ট (২০১০)	২৮.২৬	৭১.৭৪

স্বাস্থ্য খাতে জেন্ডার বৈষম্য মূলত প্রজনন ক্ষেত্র ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে নারীদের দুর্বল অবস্থানের প্রতিফলন।

সারণি: ৮ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উচ্চ মৃত্যু হার, জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রির ব্যবহারের নিম্ন হার ও ঝুকিপূর্ণ প্রসব কালীন ও প্রসব পূর্ববর্তী সেবার চিত্র নিম্নে তুলে ধরে।

সারণি ৮: স্বাস্থ্যখাতে নারীর অবস্থান

নির্দেশক	মান
মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি ১,০০,০০০ জীবিত জন্মে	১৯৪
জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার	৬১.৫
দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে জন্ম দানের হার (%)	২৬.৫
প্রসব পূর্ববর্তী সেবা (অন্তত: ৪টি সেবা)	২৩.৫

বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক উত্তরণ

রাজনীতিতে বাংলাদেশের নারীর সরব উপস্থিতি নেই। খুব স্বল্প সংখ্যক নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৫(৩) নং ধারা অনুযায়ী সংসদে নারীদের জন্যে ১৫টি আসন সংরক্ষিত ছিল। পরে অবশ্য এই নারী আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০-এ উন্নীত করা হয়। কিন্তু ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সংবিধান স্বীকৃত এই সংরক্ষিত নারী আসনসমূহের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। পরে ১৯৯০ সালে ১০ম সংশোধনীতে সংবিধানের ৬৫(৩) ধারায় পরবর্তী ১০ বছরের জন্য নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে ৩০টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। ২০০১ সালের এপ্রিলে আইনের এই ধারা অনুযায়ী নারী সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় (মাহতাব, নাজমুন্নেসা)। ২০১১ সালের ৩০ জুন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় সরকার জাতীয় সংসদে ১৫তম সংশোধনী পাশ করে যেখানে নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। এর আগে নারীদের জন্যে সংরক্ষিত ৪৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ৩৬ জন, বিএনপি সমর্থিত ৫জন এবং জাতীয় পার্টি সমর্থিত ৪ জন নারী নির্বাচিত হয়েছিলেন (বিডি নিউজ২৪.কম)।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগের শতকরা ২৩ জন প্রেসিডিয়াম সদস্য নারী এবং কার্যকরী কমিটিতে শতকরা ২.৯ জন নারী। বি এন পি'র কার্যকরী কমিটিতে শতকরা ১৪.৭ ভাগ নারী সদস্য। অন্যদিকে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে কোন নারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না (মাহাতাব, নাজমুন্নেসা)।

স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় ১৯৯৭ থেকে সরাসরি আবেদনে নারীরা নির্বাচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে প্রথম সরাসরি ভোটে নারায়নগঞ্জে নারী মেয়র (ড. আইভি রমহান) নির্বাচিত হয়েছেন। তবে স্থানীয় সরকারের সরাসরি নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা পিতৃতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে না।

বিদ্যমান আইন-কানুন

বাংলাদেশের সংবিধান জীবনের সব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমঅধিকার দিয়েছে, (অনুচ্ছেদ ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩)। কিন্তু বাস্তবে বিশেষতঃ পারিবারিক আইনে নারী সমাজের জন্য যেসব আইন-কানুন রয়েছে, তাতে নারীর প্রতি অমানবিক, অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। বিয়ে, বিয়ে-বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি আইনে এ বৈষম্য ধরা পরে। এছাড়া যৌতুক, নারী নির্যাতন সম্পর্কিত আইনও কাঠামোগতভাবে দুর্বল, ফলে তা যৌতুক ও নির্যাতন প্রতিরোধে কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ধর্ষণ আইন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, এতে নির্যাতিতের জন্য বিচার পাওয়া প্রায় দুরূহ। এ সব আইন কানুন নারীকে অধস্তন করে রাখে ও ক্ষমতাবান হতে দেয় না। বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পায় নারী, হিন্দু আইনে নারী কিছুই পায় না। এভাবে সম্পত্তি লাভে নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়। সম্পদশালী বা ক্ষমতাবান হয়ে ওঠা নারীর জন্য তাই দুরূহ। শর্তসাপেক্ষে পুরুষের বহুবিবাহের অধিকার নারীর জীবনকে বিষিয়ে তোলে। নারী নির্যাতিত হলেও তার তালাকের অধিকার নেই। আর পুরুষ এটি এত সহজে প্রয়োগ করে যে নারীকে নিঃস্ব হয়ে স্বামীর সংসার থেকে বের হয়ে যেতে হয়। মাতৃগর্ভে যে সন্তান বড় হয়ে ওঠে, মা সে সন্তানের আইনগত অভিভাবক হতে পারে না। এভাবে আইন নারীর জীবনকে কেবল বৈষম্যের শিকার করে না, অভিশপ্ত করে। বাংলাদেশ শরিয়া ল'র দোহাই দিয়ে জাতিসংঘ সনদ সিডও দলিলে পূর্ণ সম্মতি দেয় নি। বর্তমানে সিডও দলিলের ২ নম্বর ধারা ও ১৬(১) গ ধারায় বাংলাদেশের আপত্তি রয়েছে। উল্লেখ্য, এ ধারাসমূহ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ এবং বিয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

নারী নির্যাতন

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এক চরম রূপ ধারণ করেছে। শিক্ষাঙ্গনে যৌন নিপীড়ন, অফিস আদালতে যৌন নিপীড়ন, পরিবারে নারী নির্যাতন এগুলো নিত্যদিনের খবর। সম্প্রতি এ সম্পর্কিত বিচারের জন্য ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালসমূহে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা কয়েক হাজার। তার মধ্যে অতি পুরাতন মামলার সংখ্যা হলো অনেক। চলমান অতি পুরাতন মামলাগুলো বছরের পর বছর দীর্ঘসূত্রীতার কবলে পতিত হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের মামলার ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করার বিধান থাকা সত্ত্বেও ঢাকা মহা নগরীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালগুলোর এতো মামলা সাক্ষ্য প্রমাণের অপেক্ষায় রয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নঃ পরিবার

বাংলাদেশ রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিয়েছে। তা সত্ত্বেও জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্যক্তি জীবনে যে শিক্ষা, অর্থ, বুদ্ধি যা ক্ষমতাকে ধারণ করে তা রয়েছে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে। ব্যক্তির এই ক্ষমতা যখন একই লক্ষ্যে সমাজের অন্যান্য ক্ষমতার সাথে মিলিত হয় তখন তা হয় সামাজিক ক্ষমতা। বর্তমানে সমাজে বিরাজমান পিতৃতন্ত্র একধরণের সামাজিক ক্ষমতা। এই ক্ষমতার আধিপত্যে বংশ নির্ধারিত হয় পিতার দিক থেকে। সম্পদের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকারের বিষয়টি ন্যস্ত থাকে পুরুষের হাতে। এই ব্যবস্থায় পুরুষ পরিবারের মূল সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে। এবং পরিবারের উপর ক্ষমতা বজায় রাখে। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নারী কোথায় শ্রম দেবে তা নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষ। কয়জন সন্তান নেবে তার সিদ্ধান্ত দেয় পুরুষ। সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদ কাকে কিভাবে দেওয়া হবে তার সিদ্ধান্ত নেয় পুরুষ, নারীর যৌন সিদ্ধান্ত নেয় পুরুষ, নারী কোথায় যাবে আর যাবে না তা নির্ধারণ করে পুরুষ। নারীর পেশা নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষ।

নিয়ন্ত্রিত মানুষ আর স্বাধীন মানুষের চিন্তা কখনও এক হয়না। ফলত টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান যে শর্ত, জেন্ডার সমতা বাংলাদেশে তা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রথমে নারী আর শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

নারীর ক্ষমতায়নঃ নারী সংগঠন

বাংলাদেশের নারী সমাজের অর্থনীতিসহ সার্বিক ক্ষমতায়নে নারী সংগঠনসমূহ অত্যন্ত সক্রিয় ভুমিকা পালন করছে। নারী সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করা, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তনে সরকারকে চাপ প্রয়োগ, সুপারিশ প্রদান ও জনমত গঠনে নারী সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

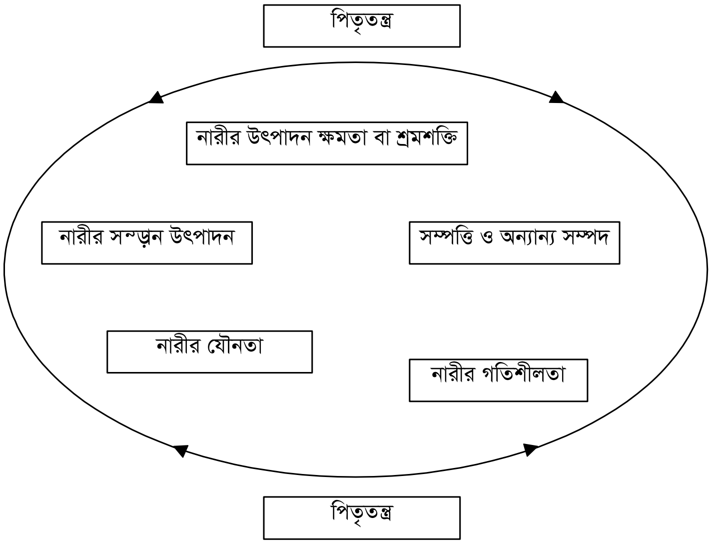

উত্তাল আন্দোলন গড়ে তুলেছে ১৯৯৭ সালের নারী নীতি বাস্তবায়ন, ২০০৪ সালের নারী নীতি রহিতকরণ, ২০০৮ সালের ঘোষিত নারী নীতি কার্যকরী করণ, ২০১১ সালের নারী নীতিতে উত্তরাধিকারে সম অংশিদারিত্ব প্রদানের জন্য। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তারা এখন অসহায় নারীর অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছে। তবে প্রসংগক্রমে এটিও বলতে হয় যে, স্বাধীনতা পূর্ব '৬৯ এর গণ আন্দোলন পরবর্তী নারী সংগঠন, এমনকি ৭০, ৮০, ৯০ এর দশকের নারী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে গণভিত্তি ছিল, সংগঠন ও সাধারণ কর্মীদের মধ্যে যে নীতিগত সম্পর্ক ছিল, এখন তেমনটি নয়। ভিত্তিটা এখন আদর্শের নয়, অফিশিয়াল। অধিকাংশ সংগঠন বিদেশী সাহায্য সংস্থার অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। জনমত গঠনের চেয়ে সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসিতে তাদের অধিকতর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়।

নারীর ক্ষমতায়নঃ বেসরকারী সংস্থা

স্বাধীনতা পরবর্তীতে বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ সামাজিক উন্নয়ন বিশেষতঃ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কাজ করে আসছে। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলোর সাথে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলো একটি আন্দোলন প্রক্রিয়া গড়ে তুলেছে। যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সিডও সনদের সংরক্ষিত ধারা প্রত্যাহারের জন্য। প্রতিবাদী হচ্ছে মৌলবাদীদের দেওয়া ফতোয়ার বিরুদ্ধে। বাংলাদেশে বেসরকারী সংস্থাসমূহের পরিচালিত কর্মসূচীর মধ্য রয়েছে- আয় ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী, পরিবার পরিকল্পনা, এ্যাডভোকেসি, পরিবেশ সংরক্ষণ, গণসংস্কৃতি, কিশোর কিশোরিদের শিক্ষা কার্যক্রম। এনজিও পরিচালিত এসব কর্মসূচীর ফলে দরিদ্র নারীদের একটি অংশের ভিতর দলীয় শক্তি, ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচীর ফলে গ্রাম পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে।

নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে যে প্রশ্নটি প্রথমে আসে সেটি হচ্ছে পুরুষকে ক্ষমতাহীন করা ছাড়া নারী কি ক্ষমতাবান হতে পারে? পরিবারে নারী যদি সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পায়, তবে যারা ঐতিহ্যগত ভাবে দীর্ঘদিন যাবত এ ক্ষমতা ভোগ করে ছিলেন তাদের কিছু ছাড় দিতে হবে। বিনিময়ে তারা পাবেন সমতার পরিবেশ। যার উপলদ্ধি বর্ণনায় ধারণ করা যায় না।

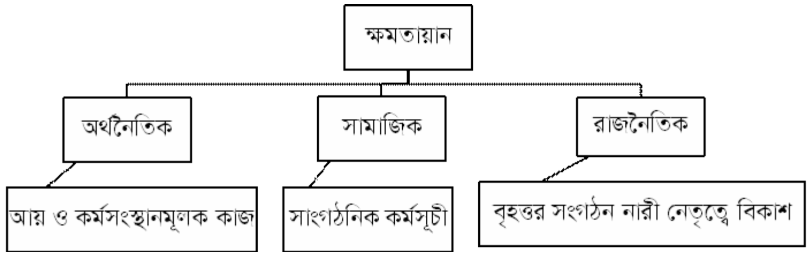

এর অর্থ এই নয় যে, নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। অনেক আন্দোলন কর্মীরও এ ভীতি আছে। তবে বেশির ভাগ দরিদ্র পুরুষ নারীর মত বঞ্চিত হওয়ায় নারীর এ অগ্রযাত্রাকে সমর্থন দিয়ে থাকে। কিন্তু বাধা আসে তখনি যখন নারী পরিবারে তার কর্তৃত্বমূলক, পিতৃতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে কথা কলে। তখন স্বাভাবিক ভাবে এনজিও পুরুষ কর্মীরাও মনে করেন, নারীর ক্ষমতায়নের কাজ ঠিক পথে এগুচ্ছে না।

বাংলাদেশের নারীনীতি বাস্তবায়ন

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী উন্নয়নের জন্য নারী নীতি বাস্তবায়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। বেইজিং কর্মপরিকল্পনার শর্ত অনুসারে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম নারী নীতি প্রণয়ন করা হয়। এতে নারীর সম উত্তরাধিকারের নীতি ছিল। এর পর ২০০৪ সালে তৎকালীন সরকারকর্তৃক ১৯৯৭ সালের নারী নীতি'র অবয়ব অক্ষুন্ন রেখে প্রায় সব নীতি নেতিবাচক অর্থে উপস্থাপন করা হয়, যা নারী সমাজের আন্দোলনের মুখে বিশেষ প্রচার লাভ করতে পারেনি। ২০০৮ সালে তত্ত্বধায়ক সরকারের আমলে যে নারী নীতি প্রদান করা হয় তাতে সম উত্তরাধিকারের কথা না থাকলেও নারীর স্ব-উপার্জিত অর্থের ব্যবহারে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও এতে অন্যান্য বিশেষ কতগুলো ইতিবাচক দিক ছিল যার জন্য নারী সমাজ এটিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মৌলবাদীদের আক্রমণের মুখে এটি হিমাগারে চলে যায়। ২০১১ সালে মহাজোট সরকার তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে নারী নীতি প্রদান করে। এবং তা মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদন করে। বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদিত এটিই একমাত্র নারী নীতি। যদিওবা নির্বাচনী মেনিফেস্টো অনুসারে সম-উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি ছিল তার পরও এই নীতি বাস্তবায়নে সরকারের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

নারীর ক্ষমতায়ন: মৌলবাদীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় নমনীয়তা

প্রশাসনের ছত্রছায়ায় চলতে থাকা ভয়াবহ মৌলবাদী সন্ত্রাসি কর্মকান্ডকে বর্তমান সরকার শক্তহাতে দমনের চেষ্টা করছে। তারপরও বাংলাদেশে এখন ফতোয়ার নামে উন্মুক্ত মাঠে হাজার হাজার জনতার সামনে নারীকে নির্যাতন করা হয়। এসব পত্রিকান্তরে প্রাকাশিত হয়। টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের এই অবনতি ঘটাতে সময় লেগেছে প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর। ৮০'র দশক থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বাংলাদেশে মৌলবাদীরা ফতোয়া জারী ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে মানবাধিকার পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করছে। মৌলবাদী ধ্যান ধারণাগুলো আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সহযোগীতা পেতে শুরু করেছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। মৌলবাদীরা রাষ্ট্রীয় সহযোগীতা পেলে মানবাধিকার কর্মীরা আরও প্রান্তিক অবস্থানে চলে যান।

৩.৩ টেকসই উন্নয়ন: বাংলাদেশে নারী ও জলবায়ুজনিত পরিবেশ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমগ্র বিশ্ব এখন ঝুঁকির সম্মুখীন, যার কারণে মানব নিরাপত্তা আজ হুমকির মুখোমুখি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পারিবারিক উন্নয়ন প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত হয়। বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিরাপত্তা আজ ক্ষতিগ্রস্ত। গ্রামীণ জনজীবনের প্রায় ৭০% ভাগ নারী দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে এবং তাদেরকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের বোঝা বহন করতে হয়। একই সাথে বলতে হয় মহিলারা জলবায়ু পরিবর্তন তথা মানব নিরাপত্তার ফলপ্রসু সমাধানেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের দেশের নারীদের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক উষ্ণতার অর্থ হলো অধিক পরিশ্রম। নারী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কন্যা সন্তানদের অধিক সময় এবং শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং রান্নার জ্বালানী সংগ্রহের কাজে, কারণ নদী-নালা দিনদিন শুকিয়ে যাচ্ছে, ভূগর্ভস্থ পানি নিচে নেমে যাচ্ছে, বন উজার হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় ৬০ থেকে ৮০ ভাগ কৃষি কর্মী নারী। জলবায়ু পরিবর্তন নারীদের জনজীবনের নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে যা সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। একথা নিশ্চিত যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে

সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তার সিংহভাগ দায়ভার বহন করছে নারীরা, তারা ফলপ্রসু সমাধানের পথ খুঁজছে এবং ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে। ইতিমধ্যে Global Call to Action against Poverty (GCAP) পৃথিবীর প্রায় ১৫টি দেশে জলবায়ু সুবিচার গণশুনানি এবং নারী ও জলবায়ু পরিবর্তন নামে ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সরাসরিভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্থ বিশেষ করে নারী তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তার দেশে ও বিশ্ববাসীর কাছে জোরালো ভাবে তুলে ধরা এবং তাদের দাবী-দাওয়া জলবায়ু নীতিতে অন্তর্ভূক্ত করা এবং এর সমাধানের পথ খুঁজে দেখা।

বাংলাদেশে অঞ্চল ভেদে টেকসই উন্নয়নের পরিবেশগত পথরেখা

দেশে এপর্যন্ত GCAP I PFM (Peoples Forum on MDG) কোয়ালিশন বাংলাদেশে এপর্যন্ত ৫টি জায়গায় গণশুনানি করেছে। জায়গাগুলোর মধ্যে বন্যা ও ভাঙ্গনপ্রবণ তিস্তা পাড়ের এলাকা - গঙ্গাচরা উপজেলা; সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার মাইজবাড়ি ইউনিয়ন, খরা প্রবণ এলাকা -রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার হুজুরি পাড়া ইউনিয়ন, শ্যমনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ, হাতিয়া উপজেলার মেঘনা পাড়ের নতুন চর নঙ্গলিয়া। এসব এলাকার প্রতিটি সমস্যাই জলবায়ুজনিত হলেও সমস্যার ধরণ ভিন্ন ভিন্ন । একইভাবে এসবের সমাধানের পথও ভিন্নতর।

সমস্যার ধরণ ও সম্ভাব্য সমাধান- একটি উদাহরণ

সমস্যার ধরণ

• বন্যায় আগে জমিতে পলি পড়তো, এখন জমিতে পলি নাই তাই আবাদ কম। • নিরাপদ পানির অভাব। • এলাকায় কর্মসংস্থানের অভাব ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকটতা। • স্থানীয় জমির মূল্যহীনতা • আকস্মিক বন্যা। • নদী ভাঙ্গন রোধে বাঁধের অপর্যাপ্ততা। • নদী ভাঙ্গনের কারণে বছরে কয়েকবার বাড়ী ঘর ভেঙে স্থানান্তর করা। • নদীর গভীরতা কমে যেয়ে চর জেগে উঠা। • নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়া। • যোগাযোগের অভাব। • সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। • কাজ নাই তাই দারিদ্র বেড়ে চলা।

সম্ভাব্য সমাধান

• সরকারী ভাবে নদীর ভাঙ্গন রোধের জন্য বাঁধ নির্মাণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া। • বন্যা মোকাবেলা, হঠাৎ বৃষ্টি রোধ এর ব্যবস্থা করতে হবে। • স্বাস্থ্য সেবা তথা স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। • সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে। • এলাকায় গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। • নদী খননের মাধ্যমে নদীর গভীরতা বাড়ানোর জন্য কাজ করতে হবে। • স্থানীয় সরকারকে জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। • জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনায় চাই সরকারী স্বচ্ছতা ও অগ্রসরতা। • স্থানীয় জনগণের সাথে সবাইকে নিয়ে জলবায়ুর বিপর্যস্ততা রোধে সচেতন ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

শেষের কথা

টেকসই উন্নয়নের প্রধান শর্ত সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন। এই বৈষম্য নিরসনের জন্যই একদিন বাংলাদশের জন্ম হয়েছিল। এ লক্ষ্যে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণার মূল মন্ত্র ছিল "বৈষম্য ভয়াবহ অন্যায়। এর প্রতিবাদ অপরিহার্য"। আর এ বিশ্বাসের গর্ভেই বাংলাদেশের জন্ম। এ বিশ্বাসের ভিত, এ আত্মপ্রত্যয় এতই দৃঢ় ছিল যে অকাতরে জীবন দিয়েছে দেশ প্রেমিক জনগণ। অগণিত নারী নিজের

জীবন, স্বামী-সন্তানের জীবন বিপদগ্রস্ত জেনেও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, খাবার দিয়েছে, গোপনে রেখেছে গেরিলা যুদ্ধাস্ত্র। ছদ্মবেশে যুদ্ধ করেছে নারী। আর আহত হয়েছে, নির্যাজিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ। বিজয়ের পর বাংলাদেশের নারীর অনন্য অর্জন দেশকে উন্নয়নের গতি দিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ দেশের দ্রুত জন্মহার হ্রাস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০ বছরে ৩.৬ শতাংশ থেকে ২০০৩ সালে ১.৪৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এ কাজটি করেছে নারী। এ হারে জনসংখ্যা হ্রাস পেতে ইউরোপে প্রায় ২০০ বছর লেগেছিল। শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় আমাদের দেশ আমাদের প্রধানমন্ত্রী পুরস্কৃত হয়েছেন। যথাসময়ে ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধ করে নোবেল বিজয়ের অংশীদার হয়েছে বাংলাদেশের নারী। রপ্তানী শিল্পের চাকা এখন নারীর হাতেই ঘুরছে। সিডরের ঘুর্ণিঝড়ের পর আমরা দেখেছি কুড়াল দিয়ে ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গাছের গুড়ি কাটছে নারী। মাথায় টিন, কোলে শিশু নিয়ে নিজ হাতেই তার আশ্রয়ের যোগান দিচ্ছে নারী। নারীনীতি ২০১১-এ যথার্থ বাস্তবায়ন, জাতিসংঘ সিডও কমিটিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সিডও এর দু'নম্বর ধারার সংরক্ষণ প্রত্যাহার, বেইজিং কর্মপরিকল্পনা অনুসারে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়ন, নারীনীতি বাস্তবায়নের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন, বাজেটে নারীর জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রদান, উন্নয়ন বাজেটের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ, নারীর অ-অর্থনৈতিক কাজের মূল্যায়ন, আইনগতভাবে ফতোয়া নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে অদম্য সাহসে। এসব চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার পথ পরিক্রমায় উজ্জীবিত হবে বাংলাদেশ। টেকসই উন্নয়নের মহাসড়কে চলতে শুরু করবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।

তথ্যপঞ্জি

১. *বাংলাদেশের সংবিধান*

২. *বেগম, হান্নানা, "সিডও ও বাংলাদেশ", সেমিনার প্রবন্ধ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, সেপ্টেম্বর, ২০০৮।*

৩. *বিদিশা, সায়মা হক, "জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ" সেমিনার প্রবন্ধ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ০৬ মে ২০১২।*

৪. *সাহা, তপতি, "নারীর ক্ষমতায়ন : ধারণাগত কাঠামো ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত", বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বিংশতিতম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৯।*

৫. *বেগম, হান্নানা, "বেইজিং কর্মপরিকল্পনার পরবর্তীতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারী", সেমিনার প্রবন্ধ, ঢাকা স্কুল অফ ইকোনোমিক্স, ২৩-২৮ এপ্রিল, ২০১১।*

৬. *আখ্তার, কাজী সুফিয়া, (২০০৬), "মৌলবাদ মানবাধিকারের অন্তরায়", বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সেমিনার প্রাবন্ধ।*

৭. *শাহমদন, "জাতিসংঘে নারীর প্রতি বৈষম্যদূরীকরণ কমিটির সমাপনী অভিমত" (অনুবাদ) উন্নয়ন পদক্ষেপ সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা জুন ২০১১।*

8. Stevens, Candice, *Are Women the key to Sustainable Development?*, Boston University

৯. *জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ফেব্রুয়ারি, ২০১১।*

১০. *শিশু অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, অক্টোবর ১৯৯৮।*

১১. *সরকার, চিত্তরঞ্জন, "মেয়ে শিশু বাংলাদেশ চিত্র", জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন সেন্টার, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট, মে ২০০৭।*

১২. *হালিম, অধ্যাপক ড. সাদেকা, "বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে প্রাসঙ্গিক বিষয়"।*